এবনে গোলাম সামাদ
রচনাসংগ্রহ ২

এবনে গোলাম সামাদ
রচনাসংগ্রহ ২

এবনে গোলাম সামাদ
রচনাসংগ্রহ ২

প্রকাশক	□	পরিলেখ ইউনিক প্যালেস (৭ম তলা) মির্জাপুর, মতিহার, রাজশাহী-৬২০৬ ঢাকা অফিস: ২৭, রাসেল সেন্টার হাটখোলা, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩
প্রথম প্রকাশ	□	একুশে বইমেলা ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব	□	লেখক
প্রচ্ছদ	□	মনিরুজ্জামান মনির
অক্ষরসজ্জা	□	আনোয়ার হোসেন এ্যাকটিভ কম্পিউটার, রাজশাহী
মুদ্রণ	□	মৌমিতা প্রিন্টিং প্রেস বাংলাবাজার, ঢাকা
মূল্য	□	আটশত টাকা মাত্র

Rochonasangraho 2 by Ebne Golam Samad
Published by Porilekh Rajshahi-Dhaka, Cover: Moniruzzaman Monir
Date of Publication: February 2022, Price: 800 Taka only

প্রসঙ্গ কথা

নতুন এক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা এবার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করলাম। পরিবর্তমান এই বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়া বা এর মোকাবেলায় আমাদের আশু কর্তব্য একটি স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও মর্যাদাবান জাতি বিনির্মাণ করা। এর জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের চর্চা, আইনের শাসন, এবং সর্বোপরি জাতিসত্তার বিকাশ। বিগত অর্ধশত বছরে অগণতান্ত্রিক, কর্তৃত্ববাদী, বশংবদ ও দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি, আত্মকলহ এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব এতে বাধা সৃষ্টি করেছে। বিশেষত জাতিসত্তার বিকাশ দিশা হারিয়েছে বারবার। আমাদের বুদ্ধিজীবি সমাজ এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে শুধু যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তাই নয়, বরং অধিকাংশ সময় তারা এসব অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডের সক্রিয় অংশীদার হয়েছেন। তবে আশার কথা একেবারেই হাতে গোণা হলেও কয়েকজন বুদ্ধিজীবি এই বশংবদ বুদ্ধিবৃত্তিক স্রোতোধারার বাইরে থেকে জাতিকে লক্ষ্যাভিমুখী করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রফেসর ড. এবনে গোলাম সামাদ এদের মধ্যে অন্যতম।

ড. সামাদ একজন বহুমাত্রিক জ্ঞানসাধক, আপসহীন বুদ্ধিজীবী এবং দেশপ্রেমিক লেখক। তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিচয়কে তুলে ধরেছেন বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। একজন সচেতন ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে স্বদেশের স্বার্থের প্রশ্নে আপসহীন ভূমিকা রেখেছেন সব সময়। তাঁর কলম বিচিত্র পথের অনুগামী হয়েছে। বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন, নৃতত্ত্ব, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি- সবক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ। মানুষ ও স্বজাতির তীব্র কল্যাণচেতনায় তিনি ক্রমাগত চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর জ্ঞানচর্চা ও লেখালেখির ক্ষেত্র বিচিত্র হলেও তার প্রধান অভিমুখ ছিল বৃহত্তর অর্থে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান, উন্মোচন ও বিকাশ এবং বিশেষত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বার্থ, স্বকীয়তা ও মর্যাদা অর্জন ও রক্ষার বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। কিন্তু তিনি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি সবকিছুকে দেখেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে।

যৌক্তিক, বৌদ্ধিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক ও সাহিত্যিক মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে ড. সামাদ প্রমাণ দিয়েছেন বাঙালি মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী। তার সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব এবং উন্মেষ ও বিকাশে বহু জাতির মিশ্রণ ও ভূমিকা থাকলেও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বাঙালি মুসলমান একক ও স্বাধীন সত্তায় উজ্জ্বল। তার আদর্শ,

বিশ্বাস, জীবনচেতনা, রীতি-নীতি, প্রকাশভঙ্গি, শিল্পচেতনা, সর্বোপরি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের একটা পৃথক ইতিবৃত্ত আছে। ফলে একটা আলাদা জনসমাজ গড়ে উঠেছে ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহৎ জনসমাজে। সে পথেই বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবোধ ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণার বাসনা জাগ্রত ও লালিত হয়েছে এবং তার থেকেই অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের। অতএব এর অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই জাতীয়তাবোধের লালন ও বিকাশের ওপর। দেশপ্রেম এবং স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তির এমন সম্মিলন বাংলাদেশে বিরল। তাঁর এসব পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, কলাম এবং অন্যান্য রচনায়।

ড. সামাদের রচনাসম্ভার বিপুল এবং বিচিত্র। তাঁর কয়েকটি বই আমরা ইতোপূর্বে প্রকাশ করেছি। একটি 'নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ' প্রকাশের ব্যাপারেও আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি সম্মতি প্রদান করেছিলেন। আমরা কাজও শুরু করেছিলাম। ইতোমধ্যে ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সকল মহল থেকে দাবি ওঠে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ এবং অগ্রন্থিত রচনাগুলো একত্র করে রচনাসমগ্র প্রকাশ করা হোক। এটা আমাদের জন্য একটি দুরূহ কাজ। তবুও আমরা উদ্যোগী হয়েছি প্রথমত ড. সামাদ এবং তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও ভক্তদের আগ্রহকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য, এবং সর্বোপরি তাঁর রচনাবলী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও মর্যাদাবান জাতি গঠনের লড়াইয়ে রসদ জোগাবে এই প্রত্যাশায়।

দীর্ঘকাল ধরে লেখা ড. সামাদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিপুল রচনাবলীর মধ্য থেকে বর্তমান 'রচনাসংগ্রহ ২'-এর জন্য আমরা বেছে নিয়েছি *আত্মপরিচয়ের সন্ধানে*, *আত্মপক্ষ* এবং *আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা ও আরাকান সংকট* তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও বেশকিছু অগ্রন্থিত রচনা। এসব গ্রন্থ ও রচনার মধ্যে পাঠক ড. সামাদের গভীর জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা এবং দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাবেন।

নাজিব ওয়াদুদ
প্রকাশক
পরিলেখ প্রকাশনী

সূ চি প ত্র

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে

১৩	প্রথম পরিচ্ছেদ	: বাংলাদেশের ঠিকানা
১৮	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: বাংলাদেশের মানব পরিচয়
২৭	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: ইসলামের অবদান
৩৭	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: হিন্দু সমাজের গড়ন
৪১	পঞ্চম পরিচ্ছেদ	: মুসলমান ও তুর্কি
৪৪	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	: সুলতানি ও বাদশাহি আমল
৫১	সপ্তম পরিচ্ছেদ	: রাজা রামমোহন রায় ও বাংলার সংস্কৃতি
৫৭	অষ্টম পরিচ্ছেদ	: বাংলা গদ্যে ইউরোপীয়দের দান
৬০	নবম পরিচ্ছেদ	: ফারায়েজী আন্দোলন
৬৪	দশম পরিচ্ছেদ	: সিপাহী অভ্যুত্থান
৬৭	একাদশ পরিচ্ছেদ	: নবাব আবদুল লতিফ
৭০	দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	: নবাব ফয়জুননেসা চৌধুরানী
৭৩	ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	: স্যার সৈয়দ আমীর আলী
৭৭	চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	: বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ
৮২	পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	: হিন্দুত্ববাদ
৮৬	ষোড়শ পরিচ্ছেদ	: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও বাংলা ভাগ
৯৫	সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	: পাকিস্তান হবার পরে
৯৭	অষ্টদশ পরিচ্ছেদ	: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন
১০৯	ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ	: উনিশশো চুয়ান্নর প্রাদেশিক নির্বাচন
১১৩	বিংশ পরিচ্ছেদ	: উনিশশো চুয়ান্নর প্রাদেশিক নির্বাচন নিয়ে আরও কথা
১১৫	একবিংশ পরিচ্ছেদ	: আইয়ুবের শাসনামল
১১৯	দ্বাবিংশ পারিচ্ছেদ	: শেখ মুজিবের ছয় দফা
১২৪	ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ	: জুলফিকার আলী ভুট্টু
১২৮	চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ	: ইয়াহিয়ার আইন কাঠামো আদেশ
১৩২	পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ	: জেনারেল আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান
১৩৪	ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ	: কলকাতার স্মৃতি
১৪৬	সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ	: ইয়াহিয়ার একটি সাক্ষাৎকার

১৪৮ অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ : ১৪ দিনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ
১৫৩ ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ
১৬৭ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : মার্কসবাদ লেনিনবাদ
১৭৩ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১৭৭ দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : ভারত ও আমাদের জাতীয় সঙ্গীত
১৮১ ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ : তাজউদ্দীন কন্যার স্মৃতিচারণ
১৮৬ চতুর্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : হাজার বছরের বাঙালি
১৯৩ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ : সাবেক পাকিস্তানের চব্বিশ বছর
১৯৬ ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ : ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে আরো কিছু কথা
১৯৯ সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ : চীন-ভারত-বাংলাদেশ
২০৫ অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ : আমাদের সংস্কৃতি
২১২ ঊনচল্লিংশ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে বিহারী
২১৫ উপসংহার
২১৭ প্রাসঙ্গিক কথা
২২০ পরিশিষ্ট

আত্মপক্ষ

২৪১ এবনে গোলাম সামাদ ও শ্রদ্ধায়...
২৪৬ পদ্মা সেতু নিয়ে কথা
২৫০ দেশের সার্বভৌমত্ব
২৫৪ প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে
২৫৮ রামকৃষ্ণ মিশনের ডাকে বাংলাদেশের সাড়া
২৬২ আওয়ামী লীগ-সিপিবি মৈত্রী
২৬৮ গরিবি হটাও
২৭২ পাহাড়ি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা
২৭৫ সুভাষ বনাম জওয়াহেরলাল
২৭৯ সিমলা চুক্তি ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার
২৮৪ মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ
২৮৮ দিল্লির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ডাক
২৯৩ উপমহাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম
২৯৭ ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা
৩০০ ইতিহাস বিকৃতি প্রসঙ্গে
৩০৩ ইকবালের দৃষ্টিতে ইসলাম ও পাশ্চাত্য

৩০৭ বাংলাদেশে হিন্দিপ্রীতি
৩১১ সংবিধান নিয়ে ভাবনা
৩১৪ বাংলাদেশে রবীন্দ্র-বন্দনা
৩১৮ উদার গণতন্ত্রের অভিযাত্রা
৩২২ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম
৩২৬ দেশের মাটিতে পা রেখে করতে হবে দেশের রাজনীতি
৩৩০ রাষ্ট্র হিসেবে চীন ও আমাদের পররাষ্ট্রনীতি
৩৩৪ ভারতের অনিশ্চিত প্রতিবেশী
৩৩৮ জাতীয় সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে কোনো আপস হতে পারে না
৩৪৩ দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম জাতীয়বাদ
৩৪৮ রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের জাতিসত্তা
৩৫৩ দুর্গাপূজা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি
৩৫৮ নদী রক্ষার আন্দোলন
৩৬৩ মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা প্রস্তরখণ্ড
৩৬৭ বাদশা আওরঙ্গজেবের শিক্ষাগুরু
৩৭১ বাংলাদেশে বাংলাভাষী মানুষই আদিবাসী
৩৭৭ সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিপ্লববার্তা
৩৮৩ জাতিসত্তা গঠনে ভাষা ও ধর্ম

আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা ও আরাকান সংকট

৩৮৯ আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা
৩৯৫ বাংলাদেশে লেনিনবাদ
৪০১ রুশ বিপ্লব নিয়ে অবান্তর উচ্ছ্বাস
৪০৫ আওয়ামী লীগ-সিপিবি মৈত্রী
৪১১ সিপিআই (এম)-এর বিচিত্র লীলা
৪১৫ প্রগতিবাজদের খপ্পরে আওয়ামী লীগ
৪২১ গভীর ভাবসঙ্কটে আওয়ামী লীগ
৪২৮ বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশুদ্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদ
৪৩৩ মহাচীনের মানব বাস্তবতা
৪৩৮ মহাচীনে ইসলাম
৪৪২ পহেলা বৈশাখ ও বাঙালিত্বের বাগাড়ম্বর
৪৪৬ ইসলামের মর্ম সন্ধানে
৪৪৯ প্রমিত বাংলার ব্যবহার

৪৫২ বিজ্ঞান ও সমকালীন ইসলামী চিন্তা
৪৫৬ ভূপেন হাজারিকার গান
৪৫৯ লোকপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ
৪৬৬ গজীপুরের ইতিবৃত্ত
৪৭১ গোলাপকে যে নামেই ডাকো
৪৭৭ আমাদের জাতীয় চেতনায় রবীন্দ্রনাথ
৪৯০ আমাদের জাতিসত্তায় রবীন্দ্রনাথ
৪৯৬ মধুসূদনের কাছে আমরা অনেক বেশি ঋণী
৫০০ গানের ভুবনে নজরুল
৫০৭ কাঁঠালের আমসত্ত্ব
৫১২ মহাত্মা গান্ধীর সর্বোদয় চেতনা
৫১৯ সুচিত্রা সেনের মোমের মূর্তি
৫২৪ নারী স্বাধীনতা নিয়ে বিভ্রান্তি
৫২৮ বর্তমান বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন
৫৩৪ রাজনীতিতে ধর্ম আর ধর্মের রাজনীতি
৫৪১ আরাকানে রোহিঙ্গা নিধন
৫৪৪ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ
৫৪৭ সেনাবাহিনী দেশকে রক্ষা করবে
৫৫১ রোহিঙ্গা-সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

৫৫৭ সন্ত্রাসবাদ
৫৬২ একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অহংকার

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে
প্রথম প্রকাশ : ২০১৫
প্রকাশক : র‍্যামন পাবলিশার্স
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০১৯
প্রকাশক : পরিলেখ প্রকাশনী

উ ৎ স র্গ

আমার নাতি ছেলে মোসাদ্দেক সামাদ
ও
মুনয়িম সামাদকে

প্রথম পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশের ঠিকানা

এই পদ্মা এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে
আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়
এ আমার দেশ এ আমার প্রেম...
কত আনন্দ বেদনা মিলন বিরহ সঙ্কটে।

বাংলাদেশের ঠিকানার কথা বলতে যেয়ে শুরুতেই আমার মনে পড়ছে ১৯৭৩ সালে কবি ও গীতিকার আবু জাফর সাহেবের রচিত বিখ্যাত গানের উপরের লাইনক'টির কথা। কেননা, এর মধ্যে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের স্বদেশ চেতনার আবেগ-অনুভব। কিন্তু আমাদের বর্তমান বইয়ের আলোচ্য, বাংলাদেশের মানুষের আত্মপরিচয়। এই পরিচয় পাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে ইতিহাসের যথেষ্ট সুদূরে। ইতিহাস বলতে আমরা বুঝবো অতীতের সেইসব ঘটনাকে, যা কাজে লাগে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করবার জন্যে। অতীতের সব ঘটনাকে আমরা ইতিহাসরূপে এই বইতে ধার্য করব না।

দেশের নাম ও সীমানা

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, পুরাকালে কোনো এক রাজার ছিল পাঁচপুত্র। এরা হলেন, অংগ, বংগ, কলিংগ, সুস ও পুণ্ড্র। এদের নাম অনুসারে পাঁচটি রাজ্যের নাম হয়। বংগ যে দেশের রাজা হন তার নাম হয় বংগ।

কারো কারো মতে, (যেমন ফরাসি বিশেষজ্ঞ, সিলভ্যাঁ লেভি) অংগ, বংগ, কলিংগ প্রভৃতি নামগুলো এসেছে চীনা পরিবারভুক্ত কোনো ভাষা থেকে। দক্ষিণ চীনের ভাষায় 'কিয়াং' (Kiang) শব্দের অর্থ হলো নদী। দক্ষিণ চীনের একটি নদীর নাম হলো সি-কিয়াং। সি মানে হলো পশ্চিম। সি-কিয়াং মানে হলো পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা নদী। যদিও নদীটা চীনের দক্ষিণে অবস্থিত। নদীটার উদ্ভব হয়েছে উনান মালভূমিতে। অংগ, বংগ, কলিংগ নামের উদ্ভব ঘটে থাকতে পারে এসব অঞ্চলের প্রাচীন নদীর নাম থেকে। কারণ, কিয়াং শব্দের অর্থ হলো নদী। কেননা, সাধারণভাবে এসব স্থানের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকছে 'য়ং' ধ্বনি। মনে করা হয় অতীতে দক্ষিণ চীন থেকে মঙ্গলীয় মানবধারার মানুষ এসে উপনিবিষ্ট হয়েছিল এসব অঞ্চলে। আর তারা দিয়েছিল এসব নদীর নাম। চীনা পরিবারের ভাষায় সাধারণভাবেই দেখা যায় যে 'য়ং' ধ্বনি নদীর নামের

সাথে যুক্ত থাকতে। যেমন, 'হোয়াংহো'। তিব্বতি ভাষায় ব্রহ্মপুত্র নদের নাম 'সাংপো'। ল্যাপচা ভাষায় তিস্তা নদীর নাম 'দিস্তাং'। অনেকে মনে করেন, তিস্তা নদীর নাম হয়েছে সংস্কৃত 'ত্রিস্রোতা' থেকে। কিন্তু এই ধারণা যথার্থ নয়। দিস্তাং থেকে বাংলাভাষায় তিস্তা নামের উদ্ভব হতে পেরেছে। এটা হলো অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিকের মতো। তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমরা বাংলাভাষাতেও চলতি কথায় নদীকে বলি গাং। চীনা পরিবারের ভাষায় আমাদের দেশে রাজবংশী, গারো ও ত্রিপুরীরা কথা বলেন। সম্ভবত এক সময় হয়তো এদেশের অনেক অঞ্চলেই ছিল এদের মতো মঙ্গলীয় মানবধারার মানুষের বাস। যে কারণেই হোক আজ আর তারা টিকে নেই। কিন্তু থেকে গিয়েছে তাদের ভাষাপরিবার থেকে আসা নাম।

পুরাকালে বাংলাদেশের নানা অংশের নানা নাম ছিল। যেমন বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটা অংশের নাম ছিল বরেন্দ্র। বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের একটা অংশকে বলা হতো সমতোট। কামরূপ বলতে বুঝাত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি অংশ ও বর্তমান আসামের পশ্চিম ভাগের একটি অংশকে একত্রে। কিন্তু 'মুলুক বংগালহ' সুলতানি আমলে এসে (খ্রিষ্ট্রীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে) ফারসি ভাষায় লিখিত একাধিক ইতিহাস বইতে (যেমন সিরত-ই-ফিরোজশাহী বইতে) পাওয়া যাচ্ছে। এ থেকেই পর্তুগিজ ভাষায় নামটা দাঁড়ায় Bengala। আর ইংরেজি ভাষায় Bengal। আর আমরা এখন বলছি বাংলাদেশ।

ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'বঙ্গ' নামের সঙ্গে ফারসি 'অহ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উদ্ভব হয় 'বঙ্গালহ' নামটি। এ থেকে মধ্যযুগের বাংলাভাষায় দেশটির নাম দাঁড়ায় 'বাঙ্গালা'। সম্রাট আকবর তার সাম্রাজ্যকে পনেরোটি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করেন। যার একটির নাম ছিল 'বংগালহ'। আবুল ফজল তার 'আইন-ই-আকবরী' বইতে লিখেছেন, আগে দেশটির নাম ছিল বংগ'। কিন্তু তারপরে 'আল' শব্দটি যুক্ত হয়ে দেশটির নাম দাঁড়ায় 'বংগাল'। কারণ, এই দেশে মাটি দিয়ে বাঁধ বেঁধে পানি আটকিয়ে চাষাবাদ করা হয়। এসব বাঁধকে বলে 'আল'। আবুল ফজল বলেছেন, সে সময় আকবরের অন্য সুবাগুলোর চেয়ে বংগাল ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ। যেখানে খাজনা আদায় করতে বেগ পেতে হতো না। অনেকে খাজনা দিত সোনার টাকায়। খুব বেশিদিন আগের ঘটনা নয়, কবি মাইকেল মধুসূদন (১৮২৩-১৮৭৩) তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায় লিখেছেন,

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

অর্থাৎ কবি মধুসূদনের সময়ও বংগ বলতে প্রধানত বুঝিয়েছে পূর্ব বাংলাকে; পশ্চিম বাংলাকে (রাঢ়) নয়।

আমরা বাংলাদেশ বলতে বুঝাব বর্তমান জাতি-রাষ্ট্র (Nation-State) বাংলাদেশকে। যা এখন জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র। যার ভৌগোলিক অবস্থান হলো ২০ ডিগ্রি ৩৫ মিনিট ও ২৬ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট উত্তর অক্ষরেখা (Latitude) এবং ৮৮ ডিগ্রি ৩ মিনিট ও ৯২ ডিগ্রি পূর্ব ৪-৫ দ্রাঘিমা রেখার (Longtitude) মধ্যে। বাংলাদেশের দক্ষিণভাগের একটি অংশের উপর দিয়ে গিয়েছে কর্কটক্রান্তি। গ্রীষ্মকালে সূর্যরশ্মি এখানে খাড়াভাবে পড়ে।

প্রাকৃতিক পরিচয়

বাংলাদেশ নদীমাতৃক। এছাড়া এর বহু জায়গাতেই ছিল এবং এখনও আছে জলাভূমি। হাওড় শব্দটা আরবি ভাষার। যার অর্থ জলাভূমি। নদী-নালা, খাল-বিলে বাংলাদেশে হয়েছে প্রচুর মাছ। বালাদেশের মানুষ মাছকে বিশেষভাবে খাদ্যরূপে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের নদী-নালা, খাল-বিলের ধারে প্রচুর বুনোধান (Oryza sativa Var. fatua, Prain) জন্মায়। উদ্ভিদবিদদের মতে এই বুনোধান থেকে উদ্ভব হতে পেরেছে আবাদী ধানের। বাংলাদেশে মানুষ অনেক প্রাচীনকাল থেকেই আরম্ভ করেছে ধানের আবাদ। আর আহার্য হিসেবে গ্রহণ করেছে ভাত। বাংলাদেশের মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে ভাত-মাছের জীবন। বাংলাদেশের মানুষ অনেক আগে থেকেই হয়ে উঠেছে সভ্য। তারা বানিয়েছে কাঠ দিয়ে বড় বড় সমুদ্রগামী নৌকা। গিয়েছে দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করতে। বাংলাদেশে এক সময় বহু রকমের নৌকা তৈরি হতো। বাংলাদেশ গ্রীষ্মপ্রধান মৌসুমি জলবায়ুর দেশ। এখানে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয়। শীতকালে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু (বঙ্গোপসাগর শাখা) এখানে প্রচুর জলীয় বাষ্প বহন করে আনে। ভেজা বাতাস শুকনো বাতাসের চাইতে হালকা। এই হালকা বাতাস হিমালয় পর্বতমালার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সহজেই উঠতে থাকে উপরে। উপরে উঠার সময় ঠান্ডা হয়ে জলীয় বাষ্প থেকে সৃষ্টি হয় মেঘের। যা থেকে হয় প্রচুর বৃষ্টি। কিন্তু বাংলাদেশে সারা বছর বৃষ্টি হয় না। শীতকালে তাই চাষাবাদ করতে গেলে প্রয়োজন হয় সেঁচের পানির। এখন আমরা চেষ্টা করছি শীতকালে সেঁচের পানির সরবরাহ বৃদ্ধি করে ফসলের আবাদ বাড়াতে। প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ ডাডলে স্টাম্প (Sir Dudley Stamp) বৃটিশ শাসন আমলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের হিসাব অনুসারে এই উপমহাদেশকে চারভাগে ভাগ করেন। যেমন- ১. ভালো বৃষ্টিপাত অঞ্চল। যেখানে বছরে গড়ে ৮০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলে সর্বত্র ধানের আবাদ করা হয়। এই অঞ্চলে হতে দেখা যায় চিরহরিৎ ঘন বন। এসব বনে দেখা যায় গর্জন গাছের (Dipterocarpus terbinatus) মতো উঁচু উঁচু পাতা না ঝরা গাছ। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলই পড়ে ভালো বৃষ্টিপাত অঞ্চলের মধ্যে। ২. মাঝারি বৃষ্টিপাত অঞ্চল। এই অঞ্চলে বছরে গড়পরতা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো ৪০ থেকে ৮০ ইঞ্চির মধ্যে। এই অঞ্চলে অনেক

রকম ফসল সেঁচের পানি ছাড়াই আবাদ করা যায়। এই অঞ্চলে দেখা যায় শালগাছের (Shorea robusta) বন। শীতকালে যাদের পাতা ঝরে যায়। ৩. স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চল। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো ২০ থেকে ৪০ ইঞ্চির মধ্যে। এই অঞ্চলকে বলা চলে শুষ্ক অঞ্চল (Dry-zone)। এখানে আবাদ করা হয় দেও-ধানের (জোয়ার) মতো ছোট দানার ফসল। আবাদ করা হয় চীনা ও কাওনের। এখানে ঘন বনভূমি হতে দেখা যায় না। এসব স্থানে ধানের মতো ফসল আবাদ করতে হলে প্রয়োজন হয় সেঁচের পানির। এখানে পাহাড়ি অঞ্চলে কোনো বনভূমি হতে দেখা যায় না। হতে দেখা যায় ছোট ছোট কাঁটা গাছের ঝোপ। ৪. মরু ও আধা মরুময় অঞ্চল। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হয় ২০ ইঞ্চির কম। এখানে কোনো ফসল সেঁচের পানি ছাড়া উৎপন্ন করা চলে না। (১ ইঞ্চি = ২৫ মিলিমিটার)।

বাংলাদেশ ছিল নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বয়ে আসা ৫৪ টি ছোট বড় নদীর পানি এখন এককভাবে ভারত বিশেষভাবে নিয়ে নিতে চাচ্ছে। ঘটতে যাচ্ছে পানির অভাব। কিন্তু আমরা যদি বর্ষার পানি ধরে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারি তবে তা দিয়েও আমরা শীতকালে ধান ও চৈতালী ফসলের আবাদ করতে পারব। বাংলাদেশ মরুভূমি অঞ্চলে পরিণত হবে না। যদিও আমাদের জীবন আগের তুলনায় হতে চাইবে অনেক শ্রমসাধ্য। আমাদের দেশের কোনো অঞ্চলেই বছরে ২০ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয় না। তাই ভারতের পক্ষে কেবল নদীর পানি আটকিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল এবং এখনও হয়ে আছে মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু-নির্ভর। ঠিক সময় বৃষ্টি না হলে এখানে দেখা দেয় খরার সমস্যা। যে কারণে হতে পারে খাদ্যাভাব, এমন কি দুর্ভিক্ষ। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে পাঁচ বছর পরপর খরার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তবে সারা বছর হয় না। এখানে জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বাতাস এ সময় সমুদ্র থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প বহন করে আনে। আমাদের দেশে তাপমাত্রা ও সূর্যের আলো সবসময় থাকে ফসল হবার উপযোগী। ফসলের ফলন এখানে তাই বিশেষভাবে নির্ভর করে প্রধানত বৃষ্টিপাতের উপর। আমাদের দেশের অনেক অঞ্চলে গড়পড়তা পাঁচ বছর পরপর সৃষ্টি হয় খরার সমস্যা। বাংলাদেশের অধিকাংশটাই গড়ে উঠেছে নদীবাহিত পলিমাটির দ্বারা। ভূমি এখানে পাহাড়ি নয়। তাই সহজেই চাষাবাদ করা চলে। ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গায় ৫, ৬ লাখ বছর আগেও ছিল অগভীর সমুদ্র। কিন্তু মানুষের মতো প্রাণীর আবির্ভাব এর অনেক আগেই হতে পেরেছে। অন্যত্র থেকে মানুষ এখানে এসে অনেক পরে গড়েছে জনপদ। আগে মনে করা হতো, মানুষ নদী তীরে প্রথম জনপদ গড়ে তোলে নদীর পানি দিয়ে কৃষিকাজ করবার জন্যে। কিন্তু এখন মনে করা হয়, নদীর ধারে মানুষ প্রথমে জনপদ গড়েছে মাছ ধরে খাবার সুবিধার কারণে। মাছ ধরে খাবার সুবিধার

জন্য মানুষ নদীর ধারে প্রথমে গড়ে তুলেছে স্থায়ী জনপদ। পরে নদীর পানির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সেখানে আরম্ভ করেছে কৃষি। মানুষ লাঙল আবিষ্কারের অনেক আগেই করেছিল তামা দিয়ে তৈরি বড়শি। যার প্রমাণ অনেক জায়গা থেকে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। কৃষি নয়, ধিবর জীবন দিয়েই সম্ভবত আরম্ভ হয়েছিল প্রাচীন বাংলাতেও জনপদের সূচনা।

দেশের মাটি

বাংলাদেশের মাটি প্রায় সবই নদীবাহিত পলিমাটির শ্রেণির আন্তর্গত। এদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলে; কারণ, অসংখ্য ছোট বড় নদী এরমধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বহুদূর থেকে ধোয়া মাটি এই সব নদীর স্রোতে ভেসে এসে পলিরূপে জমা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কেবল চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু জমিকে বলা যেতে পারে স্থিতিশীল মাটি। বাংলাদেশের পলিমাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একভাগকে বলা চলে পুরনো পলিমাটি, আর একভাগকে বলা যায় নতুন পলিমাটি। পুরনো পলিমাটির রং লালাচে। যেমন বরেন্দ্র অঞ্চলের পলিমাটি। এই পলিমাটির মধ্যে লোহা মরচে ধরার জন্যে মাটি লালচে হয়ে উঠেছে। ঢাকার কাছে অবস্থিত মধুপুর গড় অঞ্চলের মাটিও লালচে। লালমাটির কিছু অঞ্চল বাংলাদেশের কুমিল্লা অঞ্চলেও দেখা যায়। যেমন লালমাই। অবশিষ্ট্য সব পলিমাটি অঞ্চলকে বলা যায় অল্পবিস্তর নতুন। সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম বিভাগের সমুদ্র উকূলবর্তী পলিমাটি হলো সর্বাপেক্ষা নবীন পলিমাটি। স্থিতিশীল মাটি ও পুরাতন পলিমাটির মিলিত পরিমাণ অপেক্ষা নতুন পলিমাটির পরিমাণ অনেক বেশি। পুরাতন পলিমাটিতে চুন ও ফসপেটের পরিমাণ কম, কিন্তু পটাশের পরিমাণ বেশি থাকে। এই মাটি সাধারণত হয় অম্লাত্মক। নতুন পলিমাটি; যেমন- পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, শীতলক্ষ্যা প্রভৃতি নদী বাহিত পলিমাটি সরস ও হালকা। সব নদীর পলিমাটি সমান উর্বর নয়। পদ্মার পলিমাটি আর সব পলিমাটির তুলনায় বেশি উর্বর। বাংলাদেশের অধিকাংশ জমি সমতল। সমতল ক্ষেত্রে যেসব শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে ধান, পাট, গম, ইক্ষু, ভুট্টা, গোলআলু, বিভিন্ন প্রকার ডাল শস্য প্রধান। পৃথিবীতে এই রকম নদী বিধৌত সমতল ভূমি খুব কমই আছে। বাংলাদেশে যদি সেঁচের পানির অভাব না হয় এবং ভারত যদি নদীর পানি একতরফাভাবে না নিতে পারে, তবে অনেকের মতে বাংলাদেশ হতে পারে সমগ্র উপমহাদেশের খাদ্যভান্ডার। কিন্তু যেহেতু ভারত এখন তার মধ্যদিয়ে বয়ে আসা বাংলাদেশের ৫৪ টা নদীর পানি একতরফাভাবে নিয়ে নিতে চাচ্ছে, তাই তার ফলে বাংলাদেশের সাবেক ভৌগোলিক অবস্থা অনেক পরিমাণে ভিন্ন হয়ে উঠতে যাচ্ছে। সারাবিশ্বে পরিবেশবাদীরা বলছেন পৃথিবীকে সবুজ রাখতে হবে। পৃথিবীকে সবুজ রাখতে হলে সর্বত্র সেঁচের পানির সরবরাহকে দিতে হবে গুরুত্ব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশের মানব পরিচয়

মানুষ নিয়ে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সে রাষ্ট্রের মানুষের কথা কম-বেশি না এসেই পারে না। যে বিজ্ঞান মানুষ নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলে নৃ-তত্ত্ব। নৃ-তত্ত্বে মানুষকে দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাধারণত চারটি বড় ভাগে(Great Races) ভাগ করা হয়। এরা হলো ককেশয়েড (Caucasoid), মঙ্গলয়েড (Mongoloid), নিগ্রয়েড (Nigroid), ও অস্ট্রালয়েড (Australoid)। মানুষের মধ্যে এসব বাহ্যিক দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরম্পরায় বর্তায়। যা থেকে নির্ণয় করা চলে মানুষের জ্ঞাতিত্ব।

বাহ্যিক দৈহিক বিশেষত্ব (Physical features) বলতে প্রধানত বুঝায় মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রং, মাথা ও নাকের আকার-আকৃতি, মুখের গঠন, চোখের তারার রং ও চোখের পাতার বৈশিষ্ট্য, গায়ের রং, দেহের উচ্চতার পরিমাণ। চুলের রকমের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কারণ, মানুষের চুলের উপর পরিবেশের বিশেষ প্রভাব নেই। তা যথেষ্ট স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। মসৃণ তরঙ্গাকৃতি চুল বলতে বুঝায় এমন চুল, যারা শক্ত খড়খড়ে নয়। যাদের প্রচ্ছেদ করে (Section) মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখলে, চুলের প্রচ্ছেদকে দেখায় উপবৃত্তাকার (Elliptical)। সোজা খড়খড়ে চুল বলতে বুঝায় এমন চুলকে যাদের প্রচ্ছেদ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখালে দেখায় গোল (Circular)। যাকে বলে পশমি চুল, তা হয় কতকটা ভেড়ার লোমের মতো পাক খাওয়া। এসব চুলের প্রচ্ছেদ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখালে দেখায় লম্বা উপবৃত্তাকার (Lengthened ellipse)। মানুষের দৈহিক আকার আকৃতির উপর খাদ্য ও পরিবেশের প্রভাব আছে। কিন্তু চুলের উপর নেই। যেসব মানুষ যথেষ্ট খেতে পায় না অথবা বাস করে প্রতিকূল পরিবেশে তারা উচ্চতায় খাটো হতে চায়। যারা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে বাস করে এবং যদি যথেষ্ট ভালো খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে খেতে পায়, তবে তারা হতে চায় লম্বা। আর না পেলে উচ্চতায় হতে চায় খাট। এই ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অন্য দেশ থেকে যেয়ে মানুষ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবিষ্ট হয় ও তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট বেশি খেতে পায় তখন তাদের সন্তানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হতে চায় লম্বা। উচ্চতা অনুসারে মানুষকে খর্বাকৃতি, মাঝারি, লম্বা এবং খুব লম্বা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। নৃ-তত্ত্বে দৈহিক উচ্চতা বলতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উচ্চতাকে বুঝায়। গড়পরতা সব দেশেই ছেলেদের উচ্চতা মেয়েদের থেকে বেশি হতে দেখা যায়। খর্বাকৃতি বলতে বুঝায় যাদের উচ্চতা ১.৪৮ সেন্টিমিটার থেকে ১.৫৮ সেন্টিমিটার এর মধ্যে। মাঝারি উচ্চতা বলতে বুঝায় ১.৫৮২

সেন্টিমিটার থেকে ১.৬৭৬ সেন্টিমিটারের মধ্যে। লম্বা বলতে বুঝায় ১.৬৭৭ সেন্টিমিটার থেকে ১.৭২ সেন্টিমিটারের মধ্যে। এবং খুব লম্বা বলতে বুঝায় ১.৭২১ সেন্টিমিটারের উপরে যাদের উচ্চতা এরকম মানুষকে। এটা হলো নৃতত্ত্বের সাধারণ হিসাব।

আমরা বলেছি মানুষকে চারটি বড় ভাগে ভাগ করা হয়। এরা হলো, ককেশয়েড, মঙ্গলয়েড, নিগ্রয়েড এবং অস্ট্রালয়েড। ককেশয়েড মানব বিভাগের মানুষের চুল হয় মসৃণ, নাক হয় সোজা, উন্নত ও চিকন, ঠোঁট হয় পাতলা, চোখ হয় আয়ত। মঙ্গলয়েড বিভাগের মানুষের মাথার চুল মসৃণ নয়। এদের চুল হয় খড়খড়ে। মাটিতে পড়লে চুল সোজা হয়ে থাকে, কেবল চুলের মাথা সামান্য বাঁকা হয়ে থাকে। মঙ্গলয়েড বিভাগের মানুষের দেহে লোমের পরিমাণ হয় কম। মুখে দাঁড়ি গোঁফ হয় না বললেই চলে। এদের চোখের উপর পাতায় বিশেষ ধরনের ভাঁজ থাকে (Epicanthic fold)। যার জন্যে এদের চোখ ছোট ও বাঁকা দেখায়। এদের গণ্ডের হাঁড় হয় যথেষ্ট উঁচু। এজন্যে এদের মুখমণ্ডল দেখে যথেষ্ট সমতল (flat) মনে হয়।

নিগ্রয়েড বিভাগভুক্ত মানুষের চুল হলো পশমি। অর্থাৎ ভেড়ার লোমের মতো পাক খাওয়া। এদের ঠোঁট পুরু, কান ছোট, মুখমণ্ডল হতে দেখা যায় অপ্রসারিত (Prognathic face) এবং গায়ের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

যাদের ফেলা হয় অস্ট্রালয়েড বিভাগে তাদের চুল মোটা কিন্তু মসৃণ। নিগ্রয়েড বিভাগভুক্ত মানুষের চুলের মতো এদের চুল পশমের মতো পাক খাওয়া নয়। এদের কপালের মধ্যভাগ কিছুটা নিচু। আর ভুরুর হাড় হয় যথেষ্ট উঁচু (High Brow ridge)। এদের মতো মানুষের বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো অস্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীরা (Aborigine)। এই উপমহাদেশের সাঁওতাল ও ওঁরাও ও আরো কিছু উপজাতির কিছু চরিত্র এদের সঙ্গে মেলে। তাই এসব উপজাতির মানুষকে নৃতাত্ত্বিকরা উল্লেখ করতে চান ইন্দো-অস্ট্রালয়েড (Indo-Australoid) হিসেবে। কিন্তু ইন্দো-অস্ট্রালয়েডরা দৈহিক দিক থেকে পুরোপুরি অস্ট্রালয়েডদের মতো নয়। তাই অনেকে আবার এদের উল্লেখ করতে চান প্রায় অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoid) হিসেবে। এদের বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো- সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি উপজাতি। যাদের নিয়ে এখন গঠিত হয়েছে ভারতের ঝাড়খণ্ড প্রদেশ। ঝাড়খণ্ড প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে অবশ্য গ্রহণ করা হয়েছে হিন্দিকে; কোনো উপজাতির ভাষাকে নয়। এই সব উপজাতির ভাষার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী বা আদিবাসীদের ভাষার কোনো সুদূর সাদৃশ্য নেই।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষকেই স্থাপন করা চলে ককেশয়েড বিভাগে। তবে বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপর বেশ কিছু পরিমাণে মঙ্গলয়েড বিভাগভুক্ত মানুষেরও প্রভাব থাকতে দেখা যায়। বিভিন্ন বিভাগের মানুষের মধ্যে মিলন ঘটলে তাদের সন্তানের মধ্যে পিতামাতার দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্নভাবে বর্তাতে দেখা যায়। যখন পশমের

মতো পাক খাওয়া চুল-মানুষের সঙ্গে অন্য কোনো প্রকার চুল-মানুষের মিলন ঘটে, তখন তাদের মিলনজাত সন্তানদের চুল হয় পশমের মতো পাক খাওয়া। আমাদের দেশে পশমের মতো পাক খাওয়া চুলওয়ালা মানুষ সাধারণত দেখা যায় না। যখন মৃসণ ও সোজা-চুল মানুষের মিলন ঘটে, তখন তাদের চুল হতে দেখা যায় মসৃণ প্রকৃতির। যখন সাদা ও কালো মানুষের মিলন ঘটে, তখন তাদের মিলনজাত সন্তানদের গায়ের রং হতে দেখা যায় কালো ও সাদার মাঝামাঝি। অর্থাৎ বাদামি।

নৃতত্ত্বে মানুষের মাথার প্রস্থকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করলে যে শতকরা হিসাব পাওয়া যায় তাকে বলে সেফালিক ইনডেক্স (Cephalic Index)। যাদের সেফালিক ইনডেক্স ৭৫ বা তার কম হয় তাদের বলা হয় লম্বা মাথা (Dolichocephalous), যাদের মাথায় সেফালিক ইনডেক্স গড়ে ৭৫ থেকে ৮০ এর মধ্যে হয় তাদের মাথাকে বলে মধ্যম আকৃতি মাথা (Mesocephalous), আর যাদের সেফালিক ইনডেক্স ৮০ বা তার অধিক হয় তাদের বলে চওড়া মাথা (Bracheephalous)। লম্বা মাথার মানুষকে পাশ থেকে অথবা উপর থেকে দেখলে দেখায় লম্বা। চওড়া মাথাকে উপর থেকে দেখে গোল বলে মনে হয়। তাই এরকম মাথাওয়ালা মানুষকে গোল-মাথা মানুষ হিসেবেও উল্লেখ করা চলে। এ পর্যন্ত যতটুকু মাপজোখ নেওয়া হয়েছে, তাতে বলতে হয়, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ হলো মাঝারি আকৃতির মাথাসম্পন্ন। সাধারণত লম্বা ও গোল মাথা মানুষের মধ্যে মিলনজাত সন্তানকে হতে দেখা যায় গোল-মাথা। মাথার আকৃতির দিক থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে যথেষ্ট মিশ্র-প্রকৃতির মানুষও চোখে পড়ে।

এই চারটি বড় বিভাগের মানুষকে আবার ছোট ছোট উপ-বিভাগে (Races) ভাগ করা হয়। যেমন: ককেশয়েড বিভাগের মানুষকে সাধারণত পাঁচটি ছোট মানবধারায় বিভক্ত করা চলে। এরা হলো নর্ডিক, মেডিটেরিয়ান, আলপাইন, পূর্ব-ইউরোপীয় এবং দিনারিক। নর্ডিকদের মাথা লম্বা অথবা মাঝারি, চুলের রং সোনালি, নাক সোজা, উঁচু ও চিকন, গায়ের রং ফর্সা এবং চোখের তারার রং নীল। মেডিটেরিয়ানদের মাথা লম্বা, চুলের রং কালো, চোখের তারার রং কালো। গায়ের রং খুব ফরসা নয়। আলপাইনদের মাথা গোল, তারা উচ্চতায় মাঝারি, চুলের এবং চোখের তারার রং কালো। পূর্ব-ইউরোপীয়দের মাথার আকৃতি গোল, চুলের রং সোনালি এবং চোখের তারার রং নীল। দিনারিকদের চুলের রং ও চোখের তারার রং কালো, মাথার আকৃতি চওড়া, দেহের উচ্চতা লম্বা। ইউরোপের এই মানবধারার কথা মনে রাখতে হয়। কেননা, আমাদের দেশে মানবধারা বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেকে ইউরোপীয় মানবধারার ধারণাকে অনুসরণ করতে চেয়েছেন। যেটা করা উচিত নয়। তবুও এটা করা হয়েছে। যাতে হতে পেরেছে অর্থবিভ্রাট। যেমন, যাদের মাথা লম্বা এবং মাথার মধ্যভাগ কিছুটা উঁচু, উত্তর ভারতে এরকম লোককে বলা হয়েছে নর্ডিক। কিন্তু নর্ডিকদের মথার চুল সাধারণত হয় সোনালি এবং চোখের তারার রং হয় নীল। কিন্তু এদের এই বৈশিষ্ট্য নেই।

বাংলাদেশের মানুষকে অনেকে বর্ণনা করতে চেয়েছেন আলপাইন হিসেবে। কারণ, এদের অনেকের মাথা আলপাইনদের মতো গোল। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। যা ঠিক ইউরোপীয় আলপাইন মানবধারার সঙ্গে মেলে না।

ম্যাক্সম্যুলার (১৮২৩-১৯০০) ছিলেন বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি জাতিতে ছিলেন জার্মান। কিন্তু তার কর্মজীবন কেটেছে বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। ম্যাক্সম্যুলার ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বৈদিক সংস্কৃত ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় ঋক-বেদের অনুবাদ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বৈদিক সংস্কৃত (Vedic Sanskrit) আর বর্তমান সংস্কৃতকে ঠিক এক ভাষা বলা চলে না। এখনকার ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে বর্তমান সংস্কৃত (Classical Sanskrit) ভাষার উদ্ভব হয়েছে অনেক পরে। প্রধানত গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে। সম্রাট অশোকের কোনো অনুশাসন সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছে প্রধানত বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায়। প্রকৃত ভাষা বলতে বুঝায় বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলিত মুখের ভাষাকে। ঋক-বেদ প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ম্যাক্সম্যুলারের মতে প্রাচীন আর্যভাষীরা সকলে ছিলেন একই মানবধারা (Race) ভুক্ত। আর তারা কথা বলত একই ভাষায়। যা ছিল বৈদিক সংস্কৃত ভাষার খুব কাছাকাছি। আর এই মানবধারা ছিল অন্যসব মানবধারা থেকে শ্রেষ্ঠ; কায়িক, ধী ও স্মৃতিশক্তিতে। তিনি বলেন, আর্যরা করেছিল চাকার আবিষ্কার। তারা যুদ্ধ করত ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে। তারা দখল করেছিল বিশ্বের নানা অঞ্চল এবং গড়ে তুলেছিল সভ্যতা। ম্যাকসম্যুলারের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করতে হয়। কেননা, এর ফলে এই উপমহাদেশের হিন্দুদের মধ্যে ঘটে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তা-চেতনার উদ্ভব। অন্য দিকে ইউরোপে জার্মানরা ম্যাক্সম্যুলারের তত্ত্বের উপর নির্ভর করে দাবি করেন, জার্মানরা হলেন খাঁটি আর্য (Aryan) বা নর্ডিক (Nordic)। আর তাই তাদের আছে অন্য জাতিকে যুদ্ধ করে পরাভূত করে শাসন করবার অধিকার। জার্মানরা জন্মগতভাবে হলো প্রভু-জাতি। ম্যাক্সম্যুলারের আর্য জাতির বা মানবধারার (Race) ধারণা সাধারণভাবে ইউরোপে ও এই উপমহাদেশের হিন্দু মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এই উপমহাদেশে উদ্ভব হতে পারে উৎকট হিন্দুত্ববাদের ধারণা। হিন্দুরা, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা উচ্চবর্ণের বলে বিবেচিত, তারা ভাবতে আরম্ভ করেন বিশ্বের অন্য জাতির তুলনায় তারা হলেন শ্রেষ্ঠ। কারণ, তারা হলেন আর্য। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই উপমহাদেশে সৃষ্টি হতে পারে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি একটা পৃথক মুসলিম জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার। ম্যাক্সমুল্যারের ধারণার প্রভাব এসে পড়তে পেরেছিল সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপর (১৮৩৮-১৮৯৪), পড়েছিল রবীন্দ্রনাথেরও উপর (১৮৬১-১৯৪১)। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধে বাংলা ভাষাভাষী সব মানুষকে এক জাতি হিসেবে গণ্য করেননি। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, ইংরেজরা উৎপন্ন হয়েছে স্যাকশন, ডেন ও নর্মান সংমিশ্রণে। তাঁর

মতে স্যাকসন, ডেন ও নর্মান এই তিনটিই হলো আর্য বংশীয় জাতি এবং তারা সহজে একত্রে মিশেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে চারটি ভাগ লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে একটি ভাগ হলো আর্য হিন্দু, যার বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয়টি হলো আর্য-অনার্য মিশ্রহিন্দু, আর তৃতীয়টি হলো অনার্য হিন্দু এবং চতুর্থটি হলো বাংলাভাষী মুসলমান। তিনি বলেন, বাংলাভাষী মুসলমান বাংলা ভাষায় কথা বললেও জন্মগতভাবে তারা হলো বিশেষ ভাবেই একটি পৃথক জাতি। কেবল পৃথকই নয়, নিকৃষ্ট জাতি। কেননা, তাদের মধ্যে আর্য রক্তের লেশমাত্র নেই। তাঁর মতে, যেহেতু বাংলাভাষী হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা হলেন খাঁটি আর্য বংশোদ্ভব, তাই ব্রাহ্মণদের নির্দেশেই চলতে হবে হিন্দু সমাজকে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ফিরে যেতে চেয়েছেন আদি বৈদিক হিন্দু আর্য সমাজজীবনে। তিনি তাঁর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়তে চান বৈদিক তপোবনের আদর্শের উপর নির্ভর করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী স্থাপন করতে যেয়ে আর্থিক অনটনে পড়েন। তিনি তার অর্থের প্রয়োজন পূরণের জন্যে চাঁদা চেয়ে পাঠান তদানিন্তন ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের কাছে। কিন্তু দেশীয় হিন্দু রাজারা তাঁকে চাঁদা দিতে ভয় পান। তারা ভাবেন এর ফলে বৃটিশ-রাজ তাদের উপর নারাজ হবেন। একমাত্র তখনকার হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাঁকে প্রদান করেন ১ লক্ষ টাকা। তখনকার দিনে ১ লক্ষ টাকা ছিল অনেক টাকা। রবীন্দ্রনাথ এই আর্থিক অনুদান পেয়ে যথেষ্ট খুশি হন এবং বিশ্বভারতীতে কিছু মুসলমান ছাত্রের পড়বার ব্যবস্থা করেন। এসব মুসলমান ছাত্রদেরই একজন হলেন সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূম জেলার বোলপুর নামক স্থানে ২০ বিঘা জমি ক্রয় করে সেখানে একটি বড় একতলা বাড়ি নির্মাণ করেন। বাড়িটির নাম তিনি দেন 'শান্তি নিকেতন'। সেসময় এই জায়গাটি ছিল খুবই নিরালা। এখানে বসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক চেতনার চর্চা করতে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ১৯০১ সাল থেকে বসবাস আরম্ভ করেন। এখানে তিনি 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৯০১)। পরবর্তীকালে এটাই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ পায় এবং পরিণত হয় শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থানে (১৯২১)। উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে কোনো মুসলমান ছাত্রের পড়বার অধিকার ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পিতা ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হলেও হিন্দু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। এবং চাইতেন মুসলমানদের ছোঁয়াকে এড়িয়ে চলতে। যদিও ঠাকুর পরিবারের বিশাল জমিদারিতে অধিকাংশ প্রজাই ছিলেন মুসলমান। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের এক অংশের বর্ণ প্রথা নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তাই তিনি অন্য ব্রাহ্মদের থেকে আলাদা হয়ে গঠন করেছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজ। যা চলবে প্রধানত তাঁর মতো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মদের নেতৃত্বে। আসলে আদি ব্রাহ্ম সমাজ হয়ে পড়েছিল প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুত্ববাদী। তারা নিয়ম করেন তাদের প্রার্থনাসভা

পরিচালিত হবে, যেসব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম হয়েছেন, কেবল তাদের দ্বারা। অর্থাৎ এরা আর ঠিক ছিলেন না, রামমোহন রায়ের স্থাপিত ব্রাহ্ম সমাজের অনুসারী।

রবীন্দ্রনাথের পিতা ও রবীন্দ্রনাথ নিজেদের খাঁটি ব্রাহ্মণ শণিতবাহী বলে মনে করতেন। কিন্তু হিন্দু সমাজ সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষকে মনে করতেন পিরালি ব্রাহ্মণ হিসেবে। এঁদের বংশের একজন মুসলমান হয়ে যান। যার বংশধরদের বলা হয় পিরালি মুসলমান। পিরালি মুসলমানদের মধ্যে জন্মেছিলেন আজাদ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আকরম খাঁ। আকরম খাঁ জোড়া সাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে খুবই আদ্রিত ব্যক্তি ছিলেন।

বাংলাভাষী মুসলমানদের এক সময় সাধারণত বাঙালি হিসেবে গণ্য করা হতো না। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) তাঁর বহুল পঠিত উপন্যাস শ্রীকান্তের প্রথমপর্বের শুরুতে উল্লেখ করেছেন, বাঙালি ও মুসলমানের ফুটবল খেলবার কথা। যেখানে শ্রীকান্তের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে। এ থেকে বুঝা যায়, এক সময় বাঙালি হিন্দুরা বাংলাভাষী মুসলমানকে বাঙালি বলতে রাজি ছিলেন না। বাংলাভাষী মুসলমানকে বাঙালি বলা আরম্ভ হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর; তার আগে থেকে নয়। এর আগে উর্দুভাষী, বাংলাভাষী, এই উপমহাদেশের সব মুসলমানকেই কেবল মুসলমান হিসেবে উল্লেখ করা হতো। ভাষা দিয়ে তাদের পরিচয়কে পৃথক করে দেখা হতো না।

জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) তাঁর কন্যা ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীকে (যিনি পরে হন ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর পিতার মতোই হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী) ১৯২৮ সালে ইংরেজিতে কতকগুলো চিঠি লেখেন। এই চিঠিগুলো পরে একত্রিত করে ছাপা হয়, Letter from a father to his daughter নামে। এই চিঠিগুলোর আলোচ্য বিষয় ছিল, কী করে এককোষি প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণী মানুষের উদ্ভব হতে পেরেছে, কী করে মানবসমাজ সহজ থেকে জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে, রাজা-প্রজার উদ্ভব হতে পেরেছে, সেসব সম্পর্কে আলোচনা। এই চিঠিগুলোর বাংলা অনুবাদ ঢাকা থেকে ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 'মা-মণিকে বাবা' নামে। এর একটি চিঠিতে জওহরলাল তার কন্যাকে লিখেছেন 'আর্য কথাটার মানে, ভদ্রলোক, উচ্চ-মার্জিত স্বজন। আর্যরা অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয় ছিল। আর আজ! আমরা সেই আর্যদের বংশধর হয়েও পরাধীনতার শৃঙ্খলকে গলায় মালা করে পরে আছি। স্বাধীনতা হারানোর ব্যথার ব্যথা বুঝেও বুঝছি না ...'।[১] জানি না নেহেরু একথা কী করে বলতে পেরেছিলেন। কারণ, আর্যরা এই উপমহাদেশে

[১] জওহরলাল নেহেরু; *মা-মণিকে বাবা*। সম্পাদনায় মজিবর রহমান খোকা; বিদ্যাপ্রকাশ; ঢাকা। পঞ্চম সংস্করণ- ১৯৯২, পৃ. ৭৯।

এসেছিল বাইরে থেকেই আর জয় করেছিল এই উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। তারা অনার্যদের উপর করেছিল রাজ্য বিস্তার। আর চালিয়েছিল বিশেষ অত্যাচার। অনার্যরা ছিল কৃষিজীবী। তাদের ছিল উন্নত সভ্যতা। কিন্তু আর্যরা এতটা উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল না। তারা যুদ্ধ করে দখল করেছিল বিস্তৃর্ণ অঞ্চল। তারা ছিল রণনিপুণ। কিন্তু রণনিপুণতা সভ্যতার মানদণ্ড হতে পারে না।

দক্ষিণ ভারতের বিরাট অঞ্চলজুড়ে বাস করেন দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত ভাষায় কথা বলা মানুষ। নৃতত্ত্বের বিচারে এরা আর্য নয়। কিন্তু এদের ছিল খুবই উন্নত সভ্যতা। ছিল লিখিত সাহিত্য। ছিল নিজেদের অক্ষর (বত্তেলিত্ত)। জওহরলাল তাঁর চিঠিতে এদের স্থান দিতে চাননি। তাঁর চিঠি পড়লে মনে হয় ভারত যেন হলো কেবল আর্যদেরই দেশ। আজকের ভারতে উত্তর ভারত আর দক্ষিণ ভারতের মধ্যে জেগে উঠেছে আর্য অনার্য মনোমালিন্য। আমি জানি না, কেন এতদিন পরে জওহরলাল নেহেরুর চিঠিগুলোর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। কারণ এইগুলোতে ব্যক্ত অনেক কথাই এখন আমাদের জ্ঞানের পরিবর্তনের ফলে বাতিল হয়ে গিয়েছে।

সাধারণত বাংলা ভাষাকে স্থাপন করা হয় ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষা পরিবারে। কিন্তু বাংলা ভাষার সঙ্গে আর্য পরিবারভুক্ত ভাষার যথেষ্ট অমিলও আছে। যেমন আর্য পরিবারের ভাষায় ক্রিয়াপদ ছাড়া কোনো বাক্য গঠন করা চলে না। কিন্তু বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য গঠন করা যায়। যেমন আমরা বলতে পারি 'তিনি একজন ভালো লোক' এখানে ক্রিয়াপদ ছাড়াই বাক্য গঠিত হতে পারছে। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত ভাষাতেও ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য গঠন করা চলে। এ বিষয়ে বাংলা ভাষা দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত ভাষাদের কাছাকাছি। এছাড়াও অনেক বিষয়ে বাংলা ভাষার মিল খুঁজে পাওয়া যায় দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত ভাষাদের সঙ্গে। যার কথা আমরা পরে আলোচনা করবো। দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত ভাষায় যারা কথা বলে তাদের মাথার আকৃতি সাধারণত হলো লম্বা। কিন্তু বাংলাভাষাভাষী মানুষের মাথার আকৃতি তা নয়। তারা বেশিরভাগ হলো মাঝারি আকৃতির মাথা সম্পন্ন মানুষ। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সাথে দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের মানুষের অন্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যেরও আছে পার্থক্য। কিন্তু চালচলনে ও সংস্কৃতিতে আছে যথেষ্ট মিল। যেমন বাংলাভাষী মানুষ দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষী মানুষের মতোই সিদ্ধ চালের ভাত খায়। গ্রামে উলু খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরে বাস করে। বাংলাভাষী মানুষ উত্তর ভারতের আর্য ভাষী মানুষের মতো ছুরি দিয়ে তরকারিপাতি না কুটে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষী মানুষের মতো বটি ব্যবহার করে। উত্তর ভারতের আর্যভাষী মানুষ রান্নার কাজে যথেষ্ট ঘি ব্যবহার করে। কিন্তু বাংলাভাষী মানুষ তাদের রন্ধন কার্যে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষী মানুষের মতো উদ্ভিজ তেল অধিক ব্যবহার করে থাকে। কেন কী কারণে জীবন ধারায় বা সংস্কৃতিতে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ভাষী মানুষের সঙ্গে বাংলাভাষী মানুষের এরকম মিল হতে পেরেছে তা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা

হয়নি। বৃটিশ শাসনামলে তখনকার দিনে একজন খ্যাতনামা নৃ-তাত্ত্বিক রমা প্রসাদ চন্দ হিন্দু বাঙালির কিছু দৈহিক মাপজোখ গ্রহণ করেন (১৯১৬)। তিনি তাঁর বিখ্যাত Indo-Aryan Races নামক বইতে বলেন, বাঙালি হিন্দুদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় মধ্য এশিয়ার তাজিগদের সঙ্গে। তিনি তাজিগদের বলেন, আলপাইন মানবধারাভুক্ত।[২] কিন্তু বর্তমানে তাজিগদের ধরা হয় তুর্কি বা তুরানি মানবধারাভূক্ত।[৩]

মধ্যএশিয়া থেকে বারে বারে মানুষ এসেছে এবং উপনিবিশিষ্ট হয়েছে এই উপমহাদেশের নানা স্থানে।[৪] অতীতে মধ্যএশিয়া থেকে তাজিগদের অনুরূপ জাতি বাংলাদেশে এসে উপনিবিষ্ট হয়েছিল এই রকমই অনুমান করেন নৃতাত্ত্বিক রমা প্রসাদ চন্দ। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়নি। তাই বাংলাদেশের মানুষের উদ্ভব বৃত্তান্ত এখনও যথাযথভাবে লেখা সম্ভব নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্যএশিয়া থেকে তুর্কি মুসলমানরা এসে বাংলাদেশ জয় করেছিলেন। এটা ঐতিহাসিক সত্য। তবে তারা আসার ফলে এদেশের জনসমষ্টিতে তেমন কোনো বিরাট দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটেছিল বলে মনে করা যায় না। কারণ, তুর্কি মুসলমানরা এদেশে আসবার বহু আগে যারা এদেশে এসে উপনিবিষ্ট হয়ে ছিলেন, তাঁদেরও অনেকে আসলে ছিলেন তুর্কি বা তুরানি মানবধারাভুক্ত মানুষ। কুষাণরা এই উপমহাদেশে এসে গড়েছিলেন বিশাল সাম্রাজ্য। কুষাণরাও ছিলেন তুরানি মানবধারারই মানুষ। বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের মানুষের মধ্যে মঙ্গলীয় মানব বিভাগভুক্ত মানুষের যথেষ্ট প্রভাব থাকতে দেখা যায়। কিন্তু সাধারণভাবে যাদের আমরা বলি বাংলাদেশি তাদের গায়ের রং শ্যামলা, মাথার চুল মসৃণ, চোখ আয়ত, ঠোঁট পাতলা, নাক সোজা ও নাকের অগ্রভাগ উঁচু এবং এদের পুরুষের মুখে থাকতে দেখা যায় দাড়ি গোঁফের প্রাচুর্য। দৈহিক দিক থেকে বাংলাদেশি মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যে কারণে তাদের দেখে এই উপমহাদেশের অন্য মানুষদের থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করা যায়। তবে এই পার্থক্যগুলো সব ক্ষেত্রে পরিমাপ করা যায় না। কেবল চোখে দেখেই অনুভব করতে হয়। ভাষা দিয়েও এদের বর্ণনা করা কঠিন। মানবধারা ও ভাষার দিক থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু আজকের বাংলাদেশের উদ্ভব হতে পেরেছে মূলত বাংলাভাষী মুসলমান আছে বলে। তাই কেবল মানবধারা ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য দিয়েই আজকের রাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর সঙ্গে এসে যায় ইসলামের স্বাতন্ত্র্যেরও বিচার বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন। আমরা তাই এর পরের অধ্যায়ে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি। তবে আমরা ইসলাম নিয়ে আলোচনা করবো মূলত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ঠিক ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। আমাদের ইতিহাসে মানবধারা, বিশেষ করে আর্য

---

২ Walter Theimer, *The Penguin Political Dictionary*, 1939, PP. 22-23.

৩ Ramaprosad Chanda, *The Indo-Aryan Races*, Rajshahi, 1916, pp. 63- 71 and 75-78.

৪ Henri V. Vallois, *Les Races Humans*, Presses Universitaires De France, Paris, 1971, p. 43.

অনার্যের ধারণা যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তাই আমরা মানবধারা নিয়ে এই অধ্যায়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করলাম। কিন্তু মানবধারা ও ভাষার চাইতেও ধর্ম আমাদের বর্তমান ইতিহাসে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। ধর্ম অবশ্য কম-বেশি সব দেশের ইতিহাসকেই প্রভাবিত করেছে এবং করছে। কেননা, বিজ্ঞান আমাদের মূল চেতনাকে এখনও সেভাবে প্রভাবিত করছে না। কিন্তু ধর্ম এখনো হয়ে আছে আমাদের মূল-চেতনার উৎস। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে আমাদের ভালো-মন্দ এবং ন্যায় অন্যায়ের ধারণা।

মানবধারা (Race) ও এমনকি ভাষার (Language) চাইতেও ধর্ম (Religion) তাই আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে হলে অনেক ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। তাই এর পরের অধ্যায়ে আমরা ইসলাম নিয়ে কিছু আলোচনা করতে যাচ্ছি।